স্কুলে ভর্তির সমস্যা, শিক্ষার সমস্যা

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

প্রতি বছর ডিসেম্বর মাস এলে শহরাঞ্চলে শিশুর অভিভাবকদের মাথায় এক নম্বর দুশ্চিন্তা হিসেবে যেটি ভর করে তা হচ্ছে শহরের নামীদামী কোন স্কুলে তাদের ছেলেমেয়েদের ভর্তি করানো যাবে। এই দুশ্চিন্তা থেকেই তারা ছেলেমেয়েদের জন্য ভালো টিউটর খোঁজেন, কোচিং সেন্টারে ভর্তি করান, এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করেন। স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষার চেয়েও অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় নামীদামি স্কুলের ভর্তি পরীক্ষাকে। ছেলেমেয়েদের ওপর দিয়ে যায় এক ধরনের বাড়তি চাপ বা অত্যাচার; তারা খেলতে পারে না, বেড়াতে যেতে পারে না, বিশ্রামও পায় না। একটি অস্বাভাবিক জীবন এ সময় শহরাঞ্চলের শিশুদের যাপন করতে হয়।

গ্রামাঞ্চলে 'নামীদামি' স্কুলের ধারণা নেই বললেই চলে। ইদানীং কেউ কেউ শহরের মতো কোনো কোনো গ্রামে কেজি স্কুল খুলেছেন। যাতায়াতের সুযোগ থাকলে অবস্থাপন্ন পরিবারের শিশুদের এস্ব স্কুলে ভর্তি করানো হয়। এর বাইরে গ্রামে নামীদামি স্কুল বলে তেমন কিছু চোখে পড়ে না। সুতরাং, গ্রামে এ সময় শিশুদের স্কুলে ভর্তি করানো নিয়ে বাড়তি কোনো তোড়জোড়ও নেই, দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তাও কারো মধ্যে নেই। যদিও অভিযোগ আছে, স্কুলগুলোতে ভালো লেখাপড়া নেই, কিন্তু যেহেতু বিকল্প কিছু করার নেই, সামার্থ্যও অনেকের নেই, তাই এ নিয়ে তাদের ক্ষোভও তেমন নেই। অনেকটাই যেন নিয়তির ওপর ছেড়ে দেওয়ার বিষয় হয়েছে।

ছোট-বড়ো সব শহরেই এখন অবস্থা প্রায় একই রকম, অন্তত গ্রাম থেকে তো আলাদা। এখানে মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত এবং শিক্ষিত মানুষমাত্রই শিশুদের নিয়ে বেশি ভাবেন, এমনকি নিম্ন বিত্তের হলেও সকলেরই ভাবনায় থাকে যে-করেই হোক ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করাতে হবে, ভালো স্কুলে পড়াতে হবে। আসলে শহরাঞ্চলের মানুষ জীবন ও জগৎ সম্পর্কে একটু বেশি সচেতন তো বটেই। তাছাড়া তাদের কাছে-ধারে কিছু সুযোগ-সুবিধাতো আছেই যা গ্রামে নেই। শহরের মানুষজন বুঝতে পারছেন যে, আজকাল ছেলেমেয়েরা যেনতেনভাবে লেখাপড়া করলে হবে না, ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে না। সুতরাং, সকলেরই ধারণা শহরের নামী-দামী স্কুলে তাদের ছেলেমেয়েদের ভর্তি করাতে পারলে অনেকটা দুশ্চিন্তামুক্ত থাকা যাবে। এ ধরনের পরিস্থিতি খুব একটা কাম্য হতে পারে না, ছেলেমেয়েদের সুষ্ঠু লেখাপড়া এবং সুস্থ মানসিক বিকাশের জন্য সহায়ক হতে পারে না।

প্রশ্ন হচ্ছে কেন এমনটি হলো? শহরাঞ্চলে তো স্কুলের খুব একটা অভাব নেই। সত্তরের দশক পর্যন্ত না হয় অভিভাবকদের নির্ভর করে থাকতে হতো কতিপয় সরকারি-বেসরকারি স্কুলের ওপর। কিন্তু আশির দশক থেকে তো শহরগুলোতে ব্যাঙের ছাতার মতো নানান ধরনের কেজি স্কুল খোলা শুরু হয়। এখন তো দেশী-বিদেশী নানান ধরনের এ লেভেল, ও লেভেল, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে আবাসিক এলাকাগুলো ভরে গেছে। তারপরও অভিভাবকরা ছুটছেন মাত্র কয়েকটি নামীদামী স্কুলের পেছনে, অস্বাভাবিক চিন্তা-দুশ্চিন্তা নিয়ে আবারও প্রশ্ন হচ্ছে, এ কেমন করে হলো? এর কি কোনো মানে আছে? এর কি কোনো ভবিষ্যৎ আছে, প্রয়োজন আছে? এটি কী খুব একটা মেনে নেওয়ার বিষয় হতে পারে?

পেডাগোগিক্যাল সায়েন্স (শিক্ষাবিজ্ঞান)-এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে এক কথায় একে ছুড়ে ফেলে দিতে হয়। এ ধরনের অবস্থাকে অগ্রহণযোগ্য বলে রায় দেওয়া যায়। শিক্ষার কোনো বিবেচনা থেকেই শিক্ষাবিজ্ঞান গ্রহণ করছে না, সমর্থনও করছে না। কিন্তু আমাদের দেশে তো কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞানই চলছে না, সব কিছুই অচল। তাছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখাও বোধ হয় আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের প্রধান এবং একমাত্র লক্ষ্যই হচ্ছে একটি 'নামীদামী' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সনদপত্র লাভ করা, হয়তো এই সনদপত্রের বদৌলতে কোথাও একটা চাকরি পাওয়া যেতে পারে। আসলে আমরা এবং আমাদের সমাজ এর চেয়ে বেশি কিছু এখন আর শিক্ষা নিয়ে ভাবতে পারি না। ভাবার সুযোগও কেউ দেয়নি। এখন উন্নত প্রযুক্তির যুগ, হাতেকলমে কিছু শিখতে পারলে, কম্পিউটার প্রযুক্তি নাড়তে-চাড়তে পারলে কোথাও কিছু করে খাওয়া যাবে বলে অনেকেই বিশ্বাস করেন আরো দেখা হচ্ছে ছেলেমেয়েরা ইংরেজিতে কিছু বলতে পারছে কিনা, লিখতে পারছে কিনা, তা হলে দেশী-বিদেশী কিছু সংস্থার প্রয়োজনে দুচারটা প্রতিবেদন লিখতে পারবে, বা অনুবাদ করতে পারবে। আসল লক্ষ্যটা এখন শিক্ষার দাঁড়িয়েছে কর্মসংস্থানে গিয়ে— জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত গোছের কিছু হওয়ার কথা এখন এ সমাজ খুব বেশি ভাবছে না। কেননা ঐসব জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের নামধাম যৎসামান্য কিছু হলেও টাকাকড়ির ভাগ্য এদেশে তাদের নেই। ধান্দাবাজি করলে, লেখাপড়া, গবেষণা ছেড়েছুড়ে দিয়ে বড়ো বড়ো রাজনৈতিক দলের অর্ধশিক্ষিত নেতানেত্রীদের পেছনে লাইন দিতে পারলে কিছু একটা হতে পারে। কিছু একটা হওয়ার জন্য বাংলাদেশে এখন প্রকৃত অর্থে বিদ্যাশিক্ষা লাভ করতে হয় না, সেসব অন্য পথেই অর্জন করা সম্ভব। এ ধরনের ফানুস বাস্তবতাই আমাদেরকে শিক্ষাবিমুখ জাতিতে পরিণত

করে ফেলেছে।

যে কথা বলছিলাম শহরগুলোতে আশির দশকে কেজি স্কুল খোলার হিড়িক পড়ে যায়। কেজি স্কুলের কনসেপ্ট কী তা কিন্তু স্কুলগুলো যারা খুলেছেন তাদের অনেকেই জানতেন না, জানার প্রয়োজনও বোধ করেননি। দোকানপাটের মতো যে যেখানে পেরেছেন কেজি স্কুল চালু করেছেন। দেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলে একটা বড়ো প্রতিষ্ঠান বা শক্তিধর সংস্থা যে আছে তার কেউ ধার ধারেন না, ধারার প্রয়োজন ছিল। বা শিক্ষা মন্ত্রণালয়েরও বিষয়টি দেখা প্রয়োজন ছিল। তেমনটি চোখে পড়েনি। কেজি স্কুলের পরিবেশ কেমন হওয়া দরকার, বই-পুস্তকগুলো কারা যাচাই-বাছাই করবেন, নিয়ন্ত্রণ করবেন তা দেখাশোনার কেউ রইলো না। সবই বাংলাবাজার দেখার দায়িত্ব নিলো। শিশুর মানসিক বিকাশ, লেখাপড়ার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি ইত্যাদি গভীর সংবেদনশীল বিষয়গুলো দেখাশোনার কোনো অভিভাবক যেন দেশে রইলো না। গত দুই দশকের অভিজ্ঞতা আমাদের কী? ঐসব স্কুল থেকে যারা লেখাপড়া করেছে তাদের অবস্থান এখন কোথায়— এসব মূল্যায়ন বা পর্যালোচনা খুব একটা হয়েছে বলে মনে হয় না। না, আমি এসব স্কুলকে অবমূল্যায়ন করছি না। কিন্তু অপরিকল্পিত উপায়ে আর যাই হোক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া, পরিচালনা করা যায় না বলেই আমার অভিমত।

কেন আমাদের সরকারি অসংখ্য স্কুল অভিভাবকদের আকৃষ্ট করতে পারছে না? প্রাথমিক শিক্ষাকে সরকারই বা কেন গুরুত্ব দেয়নি? সরকার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শহর বা গ্রামে চালু করেছে তা মোটেও ঠিক নয়। এই শূন্যতার কারণেই শহরাঞ্চলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যত্রতত্র কেজি স্কুল গড়ে উঠেছে— যেগুলোর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক নিয়ন্ত্রণ করার কোনো অধিদপ্তর দেশে আজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অথচ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু বিদ্যালয় নেই, শিক্ষক নেই, শিক্ষাক্রম নেই, বই-পুস্তকও নেই। দেশের কোটি কোটি শিশুকে আমরা অক্ষরজ্ঞান, পরিবেশ প্রকৃতির পরিচয়, খেলাধুলা, আঁকাজোকা ইত্যাদিতে প্রস্তুত না করে সরাসরি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ বছর বয়সে নিয়ে ভর্তি করার যে নিয়ম রেখেছি তাতে গ্রামাঞ্চলের শিশুরা পুরোপুরিই প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অপ্রস্তুত থাকে। শহরাঞ্চলে অভিভাবকগণ কেজি স্কুলের দ্বারস্থ হন। এসব কেজি স্কুলের পরিবেশ, শিশু শিক্ষার

> প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু বিদ্যালয় নেই, শিক্ষক নেই, শিক্ষাক্রম নেই, বই-পুস্তকও নেই। দেশের কোটি কোটি শিশুকে আমরা অক্ষরজ্ঞান, পরিবেশ প্রকৃতির পরিচয়, খেলাধুলা, আঁকাজোকা ইত্যাদিতে প্রস্তুত না করে সরাসরি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ বছর বয়সে নিয়ে ভর্তি করার যে নিয়ম রেখেছি তাতে গ্রামাঞ্চলের শিশুরা পুরোপুরিই প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অপ্রস্তুত থাকে।

উপকরণ, শিক্ষক, শিক্ষার পদ্ধতি, লেখাপড়া, কতোটা শিক্ষণ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে হয়ে থাকে তা যাচাই করার কেউ নেই। কোনো কোনো স্কুল হয়তো সেগুলো ভালোভাবে দিতে পাচ্ছে। তবে এর জন্য অভিভাবকদের বেশ চড়া দাম দিতে হচ্ছে। তাই শুধুমাত্র উচ্চবিত্তের ঘরের শিশুদের পক্ষেই সেসব স্কুলে ভর্তি হওয়া, লেখাপড়া করা সম্ভব হচ্ছে। অধিকাংশ স্কুলই সেইসব সুযোগ-সুবিধা দিতে পারছে না, দিতে গেলে যে মূল্য পরিশোধ করতে হয় তা বহন করা অধিকাংশ অভিভাবকের পক্ষেই সম্ভব নয়। আসলে আমরা জাতিগতভাবেই ঠিক করতে পারিনি আমাদের শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার আগে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাটি গুরুত্বপূর্ণ। ফলে সে ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারের হিসাবের খাতায় বা ঘরে নেই। এখানেই শুরু হয়েছে প্রথম সমস্যা, যা দ্রুতই মারাত্মক সংকটে পরিণত হয়েছে।

দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় চাহিদা মতো নেই; যেগুলো আছে তাতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত ঠিকমতো নেই, পরিবেশ যথাযথ নয়, শিশুতোষ কোনো নীতি সেগুলোতে তেমন মানা হয় না। শিক্ষার দায়দায়িত্ব, মান- কোনটাই যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না, হচ্ছে না। এগুলোর দায়বদ্ধতা, প্রতিযোগিতার বোধ নেই বললেই চলে। ফলে অধিকাংশ অভিভাবক মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন এগুলো থেকে। খুঁজতে হচ্ছে ভালো স্কুল। শহরাঞ্চলে প্রাথমিক কোনো স্কুলই অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারছে না। এর পরিণতি মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে এনেছে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে। কিছু বেসরকারি স্কুল এ ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছে। যখনই কোনো স্কুল মোটামুটি এ ধরনের দায়িত্ববোধ কিছুটা দেখাতে সক্ষম হয়, তখনই অভিভাবককুল হুমড়ি খেয়ে পড়েন ঐ স্কুলের। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট স্কুলের ওপর চাপও পড়ে, তারাও তখন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেন না। ঐ স্কুলগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নানান ধরনের কোচিং সেন্টার, শিক্ষকরাও হয়ে ওঠেন বেশ 'দামীনামী'— বিশেষত প্রাইভেট টিউশন-এ। ফলে গোটা ব্যবস্থার মধ্যেই অসুস্থ প্রতিযোগিতা ও টাকা-পয়সার ছড়াছড়ি স্থান করে নেয়।

মাধ্যমিক স্তরেও ভর্তির এ ধরনের অগ্রহণযোগ্য প্রতিযোগিতা চলছে। এই যে ধরুন না এতোবড়ো ঢাকা শহরের কথা, প্রায় সোয়া ১ কোটি মানুষের বসবাস এই শহরে। কমপক্ষে ৩০ লাখ শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণীকে এই শহরে লেখাপড়া করতে হয়। এর মধ্যে অন্তত ১০ লাখকে তো প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে পড়তে হয়। এতো শিশু ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ঢাকা শহরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এক অর্থে বলতে গেলে নেই। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, ঢাকার শিশু ছেলেমেয়েরা যাচ্ছে কোথায়, পড়ছে কোথায়? হ্যাঁ, ভর্তি হচ্ছে অসংখ্য কেজি স্কুলে, গণশিক্ষা স্কুল, সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলে, অপরিকল্পিতভাবে তা হচ্ছে। কিন্তু এর মধ্য থেকে হাতে গোনা কয়েকটি স্কুল যখন বিশেষ যত্ন নিয়ে লেখাপড়া শেখাচ্ছে বলে শোনা যায় তখনই অভিভাবকগণ আগ্রহী হন তাদের ছেলেমেয়েদের সেগুলোতে ভর্তি করাতে। ঢাকা শহরে মাত্র কয়েকটি স্কুলের নামডাক ছড়িয়ে আছে। প্রশ্ন হচ্ছে, বাকি স্কুলগুলো কেন পারছে না স্কুলের শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করতে? সবগুলোই খুব খারাপ, তারা মোটেও চেষ্টা করছে না— এ ধরনের ধারণা আমি পোষণ করি না। অনেকেই চেষ্টা করছে, ভালোও করছে হয়তো। কিন্তু প্রচার তারা সেভাবে পাচ্ছে না। আজকাল পণ্যের বিজ্ঞাপনের মতো স্কুলেরও নামধাম খুব বিকোচ্ছে— এটি সমর্থনযোগ্য নয়। আসলে আমাদের এমনভাবে চললে হবে না। সকল আবাসিক এলাকাতেই বিদ্যমান স্কুলগুলোকে গুণগতমানে ভালো করে তুলতে হবে। এক আবাসিক এলাকার শিশুদের অন্য এলাকায় যাতে যেতে না হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাক-প্রাথমিক, প্রথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল, তা সেটি সরকারি বা বেসরকারি যাই হোক না কেন, সেগুলোর পিছিয়ে পড়ার কারণ খুঁজে দেখতে হবে, সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। দুনিয়ার কোনো উন্নত দেশের এক আবাসিক এলাকার শিশু ছাত্রছাত্রীদের অন্য আবাসিক এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার সুযোগই নেই। মিউনিসিপ্যালিটির প্রশাসন এটি অনুমোদন করে না। করে না এ কারণে যে, পৌর প্রশাসন এলাকাভিত্তিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যানবাহনসহ সকল সুযোগ-সুবিধা সমানভাবে দেওয়ার নিশ্চয়ত প্রদান করে থাকে। ফলে এক এলাকার মানুষকে অন্য এলাকার ওপর নির্ভর করতে হয় না আমাদের শহরগুলোতে সেই স্থানীয় প্রশাসন নেই, থাকলেও তারা এসব দায়িত্ব পালন করার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন না। সেই কারণেই শহরগুলোর এমন বেহাল অবস্থা। শিক্ষা ক্ষেত্রে, বিশেষত নিচের স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবেশ, শিক্ষার মান, দায়দায়িত্ব যথাযথভাবে নেওয়া গেলে শিশুদের নতুন স্কুলে ভর্তি করানো ভালো স্কুলের ক্রেজ, এ নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য অস্বস্তি, অভিভাবকদের হয়রানি, থাকবে না শিক্ষার জন্য সেই পরিবেশই তৈরি করতে হবে।

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী : অধ্যাপক ও ডিন, সমাজবিজ্ঞান, কলা ও ভাষা অনুষদ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, কলাম লেখক।

DEC 07 2001